বিজয়ের পথ

শায়খ আবু হামজাহ আল মুহাজির ﷾

مكتبة الهمّة
মাকতাবাহ আল হিম্মাহ

বাংলা ভাষায় মুদ্রিত:
জুমাদা আল আখিরাহ ১৪৩৮ হিজরি

মূল অডিও এর শিরোনাম এবং প্রকাশিত হওয়ার তারিখ:

مسالك النصر - রাবিউল আখির ১৪২৯ হিজরি

অনুবাদ:
মাকতাবাহ আল হিম্মাহ

সূচিপত্র

ভূমিকা	৬
প্রথম পথ	৮
দ্বিতীয় পথ	১১
তৃতীয় পথ	১৪
চতুর্থ পথ	১৯
পঞ্চম পথ	২৫
ষষ্ঠ পথ	৩২
সপ্তম পথ	৩৪
অষ্টম পথ	৩৬

বিজয়ের পথ

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি প্রবল প্রতাপশালী, সৃষ্টিসমূহের প্রতিপালক এবং এই দ্বীনকে নুসরত দানকারী। তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। কিছু সময় পরে হলেও তিনি হক্বকে বিজয় দান করেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আম্বিয়াগণের ইমামের ওপর এবং আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য থেকে তাঁর সাহাবাগণের ওপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সন্তুষ্ট হোন। অতঃপর,

আল্লাহ ﷻ বলেন: "তারা তাদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফেররা তা অপ্রীতিকর মনে করে। তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।" (সুরা তাওবাহ: ৩২-৩৩) তাই প্রত্যেক মুসলিমের নিশ্চিত থাকা উচিত যে, বিজয় অত্যাসন্ন, আল্লাহ এই দ্বীনকে সম্মানিত করবেন, ভবিষ্যৎ এই দ্বীনেরই জন্য, যদিও সকল জাতি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। সকল ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা অবশ্যই এই পৃথিবী শাসন করব। যে কেউ তা অস্বীকার করে বা সন্দেহ পোষণ করে, সে ভীত সন্ত্রস্ত কাফির ছাড়া আর কিছু নয়।

আল্লাহ, প্রকৃত বাদশাহ বলেন: " আমি উপদেশের পর জবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে। এতে ইবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্যে পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু আছে।" (সুরা আম্বিয়া: ১০৫-১০৬) সত্যপরায়ণ ও বিশ্বস্ত নবী ﷺ বলেন, "এই দ্বীন সেই পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে যে পর্যন্ত দিন ও রাত পৌঁছায় এবং মাটি বা পশমের তৈরি (শহর বা মরু অঞ্চলের আবাস স্থল) এমন কোন ঘর আল্লাহ বাকি রাখবেন না, যেখানে মর্যাদা কিংবা অবমাননার মাধ্যমে এই দ্বীন পৌঁছাবে না- গর্ব হল যার দরুন আল্লাহ ইসলামকে গৌরবান্বিত করেন আর অবমাননা হল যার মাধ্যমে আল্লাহ কাফিরদের দমন করেন" (আহমদ হতে বর্ণিত) তামীম আদ দারী এই হাদিস বর্ণনা করেন, যিনি পরবর্তীতে বলেন, "আমি নিজের ঘরে এর সত্যতা খুঁজে পাই। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারা প্রভূত কল্যাণ, সম্মান ও গৌরব লাভ করেছেন।

আর যারা কুফরে অবিচল থাকেছে তাদের ওপর অপমান, পরাজয় এবং জিযিয়া আরোপ করা হয়েছি"।

মুয়াহহিদদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত, এই আক্বিদাহ যার ফলে পবিত্র রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, যার জন্য শুহাদাগণ যুদ্ধ করেছেন, এর উপরই তারা জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং এর জন্যই মারা গেছেন, একদিন নিশ্চিতভাবে তা বিজয়ী হবে। এর তীর প্রত্যেক কাফিরের ঘাড়ে আঘাত হানবে এবং তা প্রত্যেক মুয়াহহিদদের অন্তরকে আলোকিত করবে। কিন্তু আমাদের অনুধাবন করতে হবে যে, বিজয়ের শর্ত হল রাসূল ﷺ কে যথাযথ অনুসরণ। যদি এই শর্ত পাওয়া যায় তাহলে বিজয় আসবে, শর্ত অনুপস্থিত থাকলে কাঙ্ক্ষিত বিজয় আসবে না। আলিমগণ যেভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, অন্য কোন কারণ নেই যা এই বিজয়ের পথে অন্তরায়। ইবন ক্বাইয়্যিম ﷺ বলেন, "এর দরুন, বিজয় এবং সম্পূর্ণ সাহায্য তারা লাভ করবে যারা ইমানে পরিপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আমি সাহায্য করব রসূলগণকে ও মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দণ্ডায়মান হওয়ার দিবসে।" (সুরা গ্বাফির: ৫১) তিনি আরও বলেন, "যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আমি তাদেরকে তাদের শত্রুদের মুকাবেলায় শক্তি যোগালাম, ফলে তারা বিজয়ী হল।" (সুরা আস-সফ: ১৪) সুতরাং যে কারও ইমানে ঘাটতি থাকবে, বিজয় এবং সাহায্য লাভের ক্ষেত্রে সে আনুপাতিকভাবে বঞ্চিত হবে"। (ইঘাছাত আল লাহফান)

রাসূল ﷺ আমাদেরকে -বিস্তারিতভাবে- বিজয়ের কারণ এবং এর পথে প্রতি-বন্ধকতার ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। ইবন ক্বাইয়্যিম ﷺ বলেন, "এভাবে রাসূল ﷺ তাদেরকে যুদ্ধের কলা-কৌশল, শত্রুর মোকাবিলা এবং পাশাপাশি বিজয় লাভের উপায় সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই শিক্ষাগুলো হলো এমন যে, যদি তারা সেটা শিখতে পারে, বুঝতে পারে আর ধরে রাখতে পারে যেভাবে তা সংরক্ষণ করা উচিত, তাহলে এমন কোন শত্রু থাকবে না যারা তাদের সামনে দাড়াতে পারে"। (ইলাম আল মুয়াক্কিয়্যিন)

প্রথম পথ

বিভিন্ন কারণের মাঝে অন্যতম কারণ হল তাওহীদ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। " (সুরা বাক্বারাহ: ২১৭) এবং তিনি বলেন, "তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।" (সুরা বুরুজ: ৮) এই বাস্তবতা সকল মুজাহিদকে বুঝতে হবে।

মুয়াহহিদিন আর কুফফারদের লড়াই হল মূলত আক্বিদার লড়াই। আল্লাহ এই শত্রুতাকে দ্বীনের মাঝে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। সুতরাং, কাফির-ধর্মনিরপেক্ষ, কমিউনিস্ট, খৃস্টান, ইহুদী-যেই হোক না কেন, অকৃত্রিম ইমান ছাড়া অন্য কোন কারণে মুয়াহহিদিনকে তারা ঘৃণা করে না। আমাদের আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কোন স্লোগান বা মূলমন্ত্র যখন ধর্ম ছাড়া অন্য কিছু বলা হয়, তখন আসলে তা নিরেট মিথ্যা, কারণ কাফির আসলি (কাফির যে কখনো মুসলিম ছিল না বা মুসলিম বলে দাবি করে নি, যেমন, ইহুদী, খৃস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ) অথবা মুরতাদ কাফির এবং মুজাহিদ মুয়াহহিদিনের শত্রুতা কখনো কোন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। এটা কেবল ইমান আর কুফরের লড়াই, আক্বিদাহগত যুদ্ধ এবং ধর্মীয় বিষয়।

আমরা দখলদার ক্রুসেডার বা আরব মুরতাদদের বিরুদ্ধে ভূমি দখলের জন্য লড়াই করি না, বরং আল্লাহর কালিমা আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করি। অনুরূপভাবে, তারাও কেবল অর্থনৈতিক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের জন্য আমাদের বিরুদ্ধে লড়ে না। যদি বিষয় তেমনি হত, তাহলে আমাদের আর তাদের জন্য একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন বা সমঝোতা বের করা সহজ হত। কিন্তু আমরা আমাদের হৃদয় আর ধমনীতে প্রবহমান রক্তকে তাদের নোংরা আক্বিদাহ আর মিথ্যাচার দ্বারা কলুষিত হতে দিব না।

প্রাচীন উপনিবেশবাদ ক্রুসেডারদের একটি ফ্রন্ট ছাড়া আর কিছু নয়, ঠিক যেমন বর্তমানে তা ইহুদী ও খৃস্টানদের একটি ফ্রন্ট। বস্তুত, "রোমানদের সিজার"

বুশ বেশ কয়েকবার ঘোষণা দিয়েছে যে, "এই যুদ্ধ হচ্ছে ক্রুসেড" ।তাহলে কেন মানুষ মিথ্যা বলে আর অস্বীকার করে?

যদি তা সঠিক জান, হে মুজাহিদ, তবে বিভিন্ন পতাকা দেখে বিভ্রান্ত হয়ো না, আর নানান মার্কা দেখেও প্রতারিত হয়ো না, ঠিক তেমনি তোমাকে অবশ্যই তোমার হৃদয় আর সারী সমূহকে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করতে হবে। অনুরূপভাবে, মনে রেখ, অন্তর ও সারিতে শিরকের উপস্থিতি বিজয়ের পথে একটি বাধা এবং দ্রুত পরাজয়ের কারণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর জালেমদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।" (আশ শুরা: ৮) তিনি আরও বলেন, "জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।" (বাক্বারাহ: ২৭০) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, "হে বৎস, আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা বড় জুলুম।" (লুক্বমান: ১৩)

অতঃপর, জেনে রাখুন যে বিজয় আর সংহতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো নিজের নিয়তকে আল্লাহর জন্য খালিস করা। আল্লাহ ﷻ বলেন, "আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন।" (আল-ফাতহ: ১৮), অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি বাইয়াহ প্রদান করার মাধ্যমে তাদের হৃদয়ে যে সত্যবাদীতা, আনুগত্য আর একাগ্রতা সৃষ্ঠি হয়েছিল (তার দরুন)।

এই আয়াত ইঙ্গিত করে যে বিজয় ও সংহতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় নিয়ামক হল আল্লাহর জন্য নিয়তকে বিশুদ্ধ করা, আর যখন ইখলাস থাকবে তখন আল্লাহ বিজয় আর সংহতির পুরস্কার প্রদান করবেন। আল্লাহ বলেন, "অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরীক না করে।" (সুরা কাহফ: ১১০) আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের জন্য আমি সবচেয়ে যা ভয় করি তা হল ছোট শিরক" (আহমেদ, মুহাম্মাদ ইবন লাবিদ হতে বর্ণিত)। ফলে, রাসূল ﷺ সাহাবাদের এ সম্পর্কে সাবধান করার ব্যাপারে খুব যত্নবান ছিলেন- বিশেষত জিহাদের ক্ষেত্রে- যেন তাদের অন্তর দূষিত না হয়। এ বিষয়ে তিনি আরও গুরুত্বারোপ করেন, জিহাদের নেতৃত্বের ব্যাপারে তাঁর এই উক্তির মাধ্যমে, "বস্তুত, আল্লাহর শপথ, আমরা এই (নেতৃত্বের) কাজে এমন কাউকে নিয়োগ দেই না যে

তা অনুরোধ করে অথবা তা পাওয়ার আশা করে” [বুখারী ও মুসলিম, আবু মুসা আল আশ’আরী ﷺ হতে বর্ণিত]

আব্দুর রাহমান ইবন সামুরাহ ﷺ বলেন যে, রাসূল ﷺ তাকে বলেন: “হে আব্দুর রাহমান ইবন সামুরাহ, কোন নেতৃত্বের পদ পাওয়ার জন্য অনুরোধ করো না, যদি কোন নেতৃত্বের পদ দাবি না করে পাও, তবে তুমি আল্লাহ কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত হবে আর যদি নেতৃত্বের পদ দাবি করে অর্জন কর, তবে তোমাকে একা ছেড়ে দেয়া হবে।” (বুখারী ও মুসলিম)

আন নববী বলেন যে, “আলিমগণ বলেন যে, নেতৃত্বের পদ দাবিদারকে নিয়োগ না দেয়ার হিকমত হল, তাকে একা ছেড়ে দেয়া হবে এবং সে আল্লাহ কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না, যেমনটা আব্দুর রাহমান ইবন সামুরাহর হাদিস থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়। আর যে (আল্লাহর) সাহায্যপ্রাপ্ত নয়, সে যোগ্যও নয়, কারণ যোগ্যতা হল নিয়োগের একটা শর্ত”। (শারহ সহীহ মুসলিম)

অনুরূপভাবে, একজন লোকের ফী-সাবিলিল্লাহ আর জিহাদের ক্ষেত্রে ভালো ইতিহাস থাকতে পারে, এমন অনেক ভালো দিক থাকতে পারে যার ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ অবগত নয়, তথাপি সে নেতৃত্বের পদের উপযুক্ত নাও হতে পারেন, যদিও সে নিজেকে তার যোগ্য বলে মনে করে। আবু যার ﷺ বলেন: “হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনি কেন আমাকে নেতৃত্বের পদ প্রদান করেন না?” ফলে তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, “হে আবু যার, তুমি দুর্বল আর এটা একটা আমানত। কিয়ামতের দিন তা দুর্দশা ও অনুতাপের কারণ হবে”। (মুসলিম)

তবে ভাল লোকদের মধ্য থেকে কাউকে অন্যদের নেতৃত্ব দেয়া জরুরী হয়ে পড়তে পারে, যখন অন্যায়ভাবে রক্তপাত করা হয় আর সম্পদ লুণ্ঠন করা হয় আর সে যদি তা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। ইয়াকুব ﷺ এর পুত্র ইউসুফ ﷺ বলেন: “আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান।” (ইউসুফ: ৫৫)

দ্বিতীয় পথ

বিজয়ের দ্বিতীয় শর্ত হল একতা, জামায়াতবদ্ধতা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। " (আল ইমরান: ১০৩)

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, "হে লোকসকল, তোমাদের অবশ্যই উচিত আনুগত্য বজায় রাখা এবং জামায়াতের সাথে থাকা, কারণ এটাই আল্লাহর সেই রজ্জু যা দৃঢ়ভাবে ধারণ করার কথা বলা হয়েছে এবং বস্তুত জামায়াতের মধ্যে তোমরা যা অপছন্দ করো তা বিভক্ত থেকে যা তোমরা যা পছন্দ করবে তার চেয়ে উত্তম।" (ইবন আল বাত্তাহ: আল ইবানাত আল কুবরাহ)

এটা সন্দেহাতীতভাবে সঠিক, যেহেতু রাসূল ﷺ বলেন, "মুসলিমের হৃদয়ে সত্যের ব্যাপারে কখনো বিদ্বেষ থাকবে না, যখন তার মাঝে তিনটি গুণ পাওয়া যাবে: ইখলাসের সাথে কাজ করা, কর্তৃত্বশীলদের সাথে একনিষ্ঠতা", অন্য বর্ণনা অনুযায়ী, "কর্তৃত্বশীলদের প্রতি আনুগত্য এবং মুসলিম জামায়াতের সাথে এক-তাবদ্ধ থাকা, কারণ মূলত তাদের প্রার্থনায় এসব সন্নিবেশিত থাকে"। [ইবন মাজাহ এবং অন্যদের কর্তৃক সংগৃহীত, যায়দ ইবন ছাবিত ﵁ হতে বর্ণিত] ইবন আল ক্বাইয়্যিম ﵀ এই প্রসঙ্গে বলেন, যে কেউ আল্লাহর সাথে তার সকল কাজ ইখলাসের সাথে করে, আল্লাহর বান্দাদের সাথে সকল কাজের ক্ষেত্রেও আন্তরিক থাকে এবং কোন রকম অনৈক্য ছাড়া মুসলিম জামায়াতের সাথে সমন্বয় বজায় রাখে, এর ফলে তার অন্তর হয় পবিত্র ও নিখাদ আর সে আল্লাহর ওলীতে পরিণত হয়। তবে যে সেরূপ নয় তার অন্তর সকল দুর্বলতা দ্বারা আক্রান্ত হবে"। (মাদারিজ আস সালিকিন)

সুতরাং, মুসলিমদের অবশ্যই একতার ওপর ভিত্তি স্থাপন করতে হবে, বি-ভক্তির ওপর নয়। বিচ্যুতি ও অনৈক্য না করে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করতে হবে। একতা দুনিয়াতে আনবে বিজয়, গৌরব ও সংহতি আর আখিরাতে আনবে চেহারার ঔজ্জ্বল্য আর স্তরের বৃদ্ধি। বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতের "সেদিন কোন কোন মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন" (আল ইমরান: ১০৬) তাফসীরে ইবন আব্বাস ﵄ বলেন যে: "আহলুস সুন্নাহ

আর জামায়াতের অনুসারীদের চেহারায় ঔজ্জ্বল্য থাকবে আর বিদাআত আর বিভক্তির লোকদের চেহারা হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন"। (তাফসীর ইবন আবি হাতিম)

বিভক্তির দ্বারা কখনো বিজয় বা গৌরব অর্জিত হয় নি, যদি আমাদের উমা-রাগণ আল্লাহর জমিনের সর্বোত্তম আর সবচেয়ে সাহসী কেউ হন তবুও। এমনি ছিল আমিরুল মুমিনিন আলী ইবন আবি তালিব ﷺ এর সময়কার অবস্থা, যদিও সেসময় দুনিয়ায় পদচারণাকারী তাঁর চেয়ে উত্তম কেউ ছিল না, তদুপরি, উম্মাহ তখন বিভক্ত হয়, এক দল তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, পরবর্তীতে কতিপয় খাও-য়ারিজও, আল্লাহ আমাদেরকে তাদের থেকে হেফাজত করুন, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে, এমনকি তখন তিনি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একটি সেনাবা-হিনীও প্রস্তুত করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ছিলেন।

রাফিদাদের দাবীকৃত বারো ইমামের আলোচনা প্রসঙ্গে ইবন তাইমিয়্যাহ ﷺ বলেন: "আলী ﷺ ছাড়া তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিলো না যার উত্তোলন করার মত একটি তরবারি আছে, তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর খিলাফাহর সময় কাফিরদের ভূমিতে আঘাত হানতে পারেন নি, তাদের কোন শহর দখল বা কোন কাফিরকে হত্যা করতেও সক্ষম হন নি। বরং মুসলিমগণ তখন একে অন্যের সাথে বিবাদে লিপ্ত ছিল, এমনকি কুফফারদের মধ্য থেকে মুশরিকগণ আর প্রাচ্য ও শামের আহলে কিতাবরা এই সুযোগে -যে রূপ বর্ণিত হয়েছে- মুসলিমদের কিছু জায়গা দখল করে নেয়"। (মিনহাজ আস-সুন্নাহ)

সারিকে বিভক্তি আর নেতৃত্ব নিয়ে মতবিরোধের ফলে উদ্ভূত আল জামালের যুদ্ধ এক বেদনাদায়ক উদাহরণ। বিপরীতে, দুর্ভিক্ষের বৎসরে উম্মাহ যখন মুয়াবিয়া ﷺ এর সমর্থনে একত্র হয়, তিনি সেনাবাহিনী গঠন করে ভূমি জয় করেন এবং যাকাত সংগ্রহ করেন এবং সম্পদ বণ্টন করেন।

কেউ অস্বীকার করবে না যে, আলী ﷺ ছিলেন মুয়াবিয়া ﷺ এর তুলনায় অধিক মুত্তাকী, সাহসী, বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ, তথাপি সকল মতানৈক্যই খারাপ। রাসূল ﷺ বলেন, "যে কেউ আনুগত্য ত্যাগ করে জামায়াত থেকে বের হয়ে যায়, অতঃপর মৃত্যু বরণ করে, তার মৃত্যু হয় জাহিলিয়াতের ওপর। আর যে কেউ অন্ধ কোন ব্যানারের অধীনে জাতীয়তাবাদে ক্রুদ্ধ হয়ে বা জাতীয়তাবাদের দিকে আহবান করে যুদ্ধ করে এবং নিহত হয়, তবে সে জাহিলিয়াতের ওপরে নিহত হয়"। (আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, মুসলিম) তিনি ﷺ আরও বলেন, "কেউ তার আমিরের কোন কিছু অপছন্দ করলে তাকে অবশ্যই সবর করতে হবে, কারণ যে

জামায়াত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গিয়ে মৃত্যু বরণ করে তার মৃত্যু হয় জাহিলিয়াতের ওপর"। [ইবন আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, বুখারী ও মুসলিম]

নিশ্চয়ই, আল্লাহর সহায়তায় যতক্ষণ আমাদের অন্তর এক আমিরের ওপর ঐক্যবদ্ধ থাকে, যার ব্যাপারে আমরা ভাল ধারণা পোষণ করি এবং তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত মিথ্যা দাবি ও সন্দেহ খণ্ডন করি, তখন আমেরিকাও যদি তার সমস্ত শক্তি নিয়ে আসে -এর সব নারী, পুরুষ সহ- আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, বস্তুত, সেক্ষেত্রে আমরাই বিজয়ী হব। সুতরাং, হে আল্লাহর সৈনিক, এমন যে কেউ থেকে সাবধান থাকো যে সারিকে বিভক্ত করতে চায়।

তৃতীয় পথ

বিজয়ের তৃতীয় শর্ত হল আমীরের কথা শোনা ও মান্য করা এবং আল্লাহর আদেশ অনুসরণ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, " তোমরা আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং ঐ অঙ্গীকারকেও যা তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন, যখন তোমরা বলেছিলে: আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।" (মায়দাহ: ৭) উবাদা ইবন সামিত ﷺ বলেন, "আমরা রাসূল ﷺ কে বাইয়াহ প্রদান করলাম এই মর্মে যে, আমরা পছন্দ ও অপছন্দ, সহজ ও কঠিন সকল অবস্থায় শুনবো ও মানবো এবং নিঃস্বার্থভাবে তা করবো। আর কর্তৃত্বশীলদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হব না, যতক্ষণ না তাদের মাঝে প্রকাশ্য কুফর দেখতে পাই, যে ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে প্রমাণ থাকে"। (বুখারী ও মুসলিম) অন্য বর্ণনা অনুযায়ী "সক্রিয় ও আলস উভয় অবস্থায় শোনা ও মান্য করা" আল্লাহর রাসূল ﷺ আরও বলেন, "শোনো ও মান্য করো যদি কোন দাসকে তোমাদের ওপর নিযুক্ত করা হয় আর সে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের নেতৃত্ব দেয়"। (উম্মুল হুসাইন হতে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত) ইবন হাজর এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, "আমিরকে আনুগত্যের আদেশ সকল আমিরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তিনি খলিফা হোন বা না হোন।" (ফাতহ আল বারী)

রাসূল ﷺ বলেন, "আমি তোমাদের পাঁচটি বিষয়ের আদেশ দিচ্ছি যে সম্পর্কে আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন: জামায়াত, শোনা, মান্য করা, হিজরত ও জিহাদ" (আহমদ, আত-তিরমিযী, হারিছ আল আশআরী হতে বর্ণিত)

এখানে আমি যে বিষয় জোর দিয়ে বলতে চাই তা হল অপছন্দ ও কঠিন অবস্থায় সততার সাথে শোনা ও মান্য করা এবং গুরুত্বের সাথে আল্লাহর আদেশ অনুসরণ করা, কারণ আল্লাহর সাহায্যে, পছন্দনীয় ব্যাপারে মান্য করা একটি সহজ ব্যাপার। যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি সাবধান করি, তা হল যুদ্ধের সময় অবাধ্যতা, যেহেতু একাধিকবার আমরা তার পরিণতি দেখেছি এবং সবসময়ই তা ছিল বড় দুঃখের কারণ।

এর একটা উদাহরণ হল, রাসূল ﷺ এর সাথে সাহাবাদের উহুদ যুদ্ধের ঘটনা। তিনি প্রত্যেক সেনা ইউনিটের দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেন, তীরন্দাজদের এমন জায়গায় রাখেন যেন তারা ভাইদেরকে পেছন থেকে দেখতে পায়, আর তাদের প্রতি শত্রুদের পক্ষ থেকে ঘেরাও অথবা সম্ভাব্য হামলার প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে পারে। তিনি পরিষ্কার ভাষায় তীরন্দাজদের বলেন: "আমাদের পেছন থেকে খেয়াল করো। যদি আমাদের মারা যেতে দেখ আমাদের সমর্থনে এগিয়ে এসো না আর যদি আমাদের গণিমত সংগ্রহ করতে দেখ আমাদের সাথে

তাতে অংশ নিতে এসো না"। [ইবন আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, আহমেদ] কিন্তু তীরন্দাজগণ আল্লাহর রাসূলের ﷺ আদেশে কর্ণপাত করে নি, পরিণামে মুসলিমগণ পিছু হঠে আর এর ফলে প্রভূত ক্ষতি সাধন হয় এবং তা এ কারণে যে, সেনাবাহিনীর একটি অংশ তাদের সেনাপতির দ্ব্যর্থ হীন আদেশ ও তাদের প্রতি সাবধান বাণী অমান্য করে।

এ থেকে দেখা যায় যে, সামরিক আদেশ অমান্যের তড়িৎ পরিণতি আসে, কোন সৈনিকের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ যদি আমিরের ইজতিহাদের বিপরীত হয় - আপাতঃ পক্ষে তা ভাল ও ঠিক মনে হলেও- তা বড় ভুল, যা অশুভ পরিণতির দ্বার উন্মোচন করে। অপরদিকে, কোন সৈনিক আমিরের আনুগত্য করে আল্লাহর ইবাদত হিসেবে, যতক্ষণ সে শরয়ী বিরোধী কোন কিছুর আদেশ তাকে না করে।

সেনা কর্মকাণ্ডে ইজতিহাদের এখতিয়ার শুধু আমিরের, অন্য কারও কেবল সুপারিশ বা পরামর্শ দেয়া ব্যতীত সেই অধিকার নাই। এটা এমন যার প্রতিফলন এই উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায়: "কোন আমিরের নেতৃত্বের দায়িত্ব বলে গৃহীত সিদ্ধান্ত বা মতামত কোন ব্যক্তিগত মুসলিমের মতামত দ্বারা নাকচ হয় না।" (ইবন মুফলিহ: কিতাব আল ফুরু)

দেখুন, হে আল্লাহর বান্দা, কঠিন ও কষ্টের সময় শোনা ও মান্য করার ফলে কী বরকত লাভ করা যায়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, রাসূল ﷺ যখন যুদ্ধাহত মুসলিমদের, তাদের ব্যথা ও আহত অবস্থা সত্ত্বেও, উহুদের সময় যুদ্ধের নির্দেশ দেন, যখন তিনি জানতেন যে, আবু সুফিয়ান মুসলিম বাহিনীর অবশিষ্ট সবাইকে নিঃশেষ করার অভিপ্রায় নিয়ে ফিরে আসবে। মুসলিমগণ আল্লাহ এবং তার রাসূলের ﷺ আদেশে সাড়া দিলেন। (ফলে আবু সুফিয়ানের পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে গেল) আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যারা আহত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেজগার, তাদের জন্য রয়েছে মহান সওয়াব।" (আল ইমরান: ১৭২)

আহযাবের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময়ও তাদের একই রকম অবস্থা ছিল। যদিও দুশ্চিন্তার কারণ দূর হওয়ায় তারা আরামের প্রত্যাশী ছিলেন, নিরাপত্তার রহমত উপভোগ করছিলেন, এমনকি প্রলম্বিত অবরোধের ধকল তারা ঠিকমত কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, এরই মধ্যে তৎক্ষণাৎ আরেকটি যুদ্ধের আদেশ আসল। "বনু কুরাইযায় না পৌঁছে কেউ আসরের সালাত পড়বে না"। [ইবন উমর ﷺ হতে বর্ণিত, বুখারী ও মুসলিম] তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের ﷺ প্রতি সত্যপরায়ণ হয়ে আদেশের অনুসরণ করলেন। তাই সত্যপরায়ণ হয়ে

শোনা ও মানার দরুন এবং গুরুত্বের সাথে আল্লাহর আদেশ অনুসরণের ফলে শত্রুদের ওপরে তারা বিজয় লাভ করলেন।

রাসূল ﷺ বলেন, "যে কেউ আমাকে মান্য করল সে আল্লাহকে মান্য করল আর যে কেউ আমাকে অমান্য করল সে আল্লাহকে অমান্য করল; এবং যে কেউ আমার আমিরকে মান্য করল সে আমাকে মান্য করল আর যে কেউ আমার আমিরকে অমান্য করল সে আমাকে অমান্য করল"। [আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত, বুখারী ও মুসলিম]

কতিপয় বিষয় যা শোনা ও মানার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

প্রথমত: আমিরের প্রতি সুধারণা রাখা, যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন, "মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কতক ধারণা ভুল।" (হুজুরাত: ১২) সাধারণভাবে কোন মুসলিমের প্রতি সুধারণা রাখা ওয়াজিব, আমিরের ক্ষেত্রে তা অধিকতর প্রযোজ্য। জিহাদের ক্ষেত্রে আমিরের প্রতি কুধারণা পোষণের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কিছু নেই। কিভাবে তা নয়, যখন এ ধরনের উদ্ভূত ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যাচার? রাসূল ﷺ বলেন, "তোমরা কুধারণা থেকে বিরত থাকো, কেননা তা সবচেয়ে বড় মিথ্যা"। [আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত, বুখারী ও মুসলিম]

"ফাইদ আল কাদির" এর লেখক বলেন, "কারও সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির খারাপ ধারণা পোষণ যা যথার্থ নয়, তা ঐ ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতার অভাবকে ইঙ্গিত করে, যেহেতু বলা হয়ে থাকে, 'কারও আমল যখন খারাপ হয়, তখন তার ধারণাও সেরূপ হয়।'"

দ্বিতীয়ত, আমিরকে সম্মান করা। ইমাম আহমেদ হতে বর্ণিত যে মুয়াজ ﷺ বলেন, "রাসূল ﷺ আমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করেন, যদি তার কোন একটি কেউ সংরক্ষণ করে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা পাবে: অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, জানাজায় শরিক হওয়া, আল্লাহর রাহে অভিযানে বের হওয়া, সম্মান ও শ্রদ্ধা করার জন্য নেতার নিকট গমন অথবা ঘরে অবস্থান করা যাতে মানুষ জন তার থেকে এবং সে তাদের থেকে নিরাপদ থাকে"।

আমিরকে সম্মান করা ও শ্রদ্ধা জানানো হয় তাকে মান্য করা আর সমর্থনের মাধ্যমে, পাশাপাশি তার ভাল দিক তুলে ধরা, তার আদেশ পালনে ছুটে যাওয়া

এবং ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে। ইবন হাজর বলেন, "নেতৃত্বের প্রতি মুসলিমদের আন্তরিকতা সম্পন্ন হয় তাদের দায়িত্বে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে, তারা যখন (দায়িত্বে) উপেক্ষা করে তখন স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে, তারা ভুল করলে সংশোধনের মাধ্যমে, অন্যদেরকে তাদের দিকে আহবান করে একত্র করার মাধ্যমে এবং পিছু হঠা ব্যক্তিদের তাদের দিকে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে"। (ফাতহ আল বারী)

চতুর্থ পথ

বিজয়ের চতুর্থ কারণ হল সবর এবং দৃঢ়তা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "হে ঈমানদানগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মুকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লা-হকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সফলকাম হতে পার।" (আল ইমরান: ২০০) যেহেতু রাস্তা কঠিন তাই পর্যাপ্ত রসদ সরবরাহ থাকতে হবে আর যেহেতু তা কষ্টসহিষ্ণু ও ক্লেশ দায়ক তাই সবর এবং দৃঢ়তা থাকা দরকার। এবং যেহেতু জিহাদ হল ইবাদত যা আল্লাহ আমাদের উপর ফরয করেছেন তাই আমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে, পরীক্ষা যতই কঠিন বা ক্লান্তিকর হোক না কেন। এমনকি, বাতিল যদি ব্যাপক ও বিস্তৃত হয় আর হক্কের সমর্থন অপ্রতুল হয়, তথাপি জোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

আবু উবায়দা ইবন আল জাররা ﷺ রোমানদের সৈন্য সমাবেশ এবং তার প্রেক্ষিতে উদ্ভূত উদ্বেগের কথা জানিয়ে উমর ইবন খাত্তাব ﷺ কে লিখলে তিনি জবাবে তাকে এই কথা লিখেন: "পর সমাচার, মুমিন বান্দার উপর যা কিছু দুঃখ--দুর্দশা পতিত হয়, তারপরে আল্লাহ স্বস্তি দান করেন। বস্তুত, বিপদাপদ দুইটা স্বস্তিকে কখনো আচ্ছন্ন করবেন না।[১] অধিকন্তু, আল্লাহ তার কিতাবে বলেন, "হে ঈমানদানগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মুকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।" [যায়দ ইবন আসলাম ﷺ হতে বর্ণিত, মালিক]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, "এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।" (বাক্বারাহ: ১৫৫) আত তাবারী বলেন, "আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ এর অনুসারীদের বলছেন যে, তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করবেন, যাচাই করবেন যে, কারা মুহাম্মাদ ﷺ কে অব্যাহত ভাবে অনুসরণ করে আর কারা পিছু হঠে যায়"। (আত তাফসীর)

যেকোন ক্ষেত্রে সবরের পরিণাম ভাল। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্যে উত্তম।" (আন নাহলঃ ১২৬) সুতরাং, আল্লা-হর সাহায্যের অন্বেষণ করুন এবং পূর্ববর্তী মুজাহিদগণ যেরূপ বলতেন সেরূপ বলুন, "আর যখন তালূত ও তার সেনাবাহিনী শত্রুর সম্মুখীন হল, তখন বলল, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ-আর আমাদের সাহায্য কর সে কাফের জাতির বিরুদ্ধে।" (আল

১ তিনি সুরা আশ শারহ এর ৫-৬ নং আয়াতের ইঙ্গিত করেছেন।

বাক্বারাহ: ২৫০) আর আক্রান্ত মুয়াহহিদগণ যেরকম বলতেন সেরকম বল, "হে আমাদের রব আমাদের জন্য ধৈর্য্যের দ্বার খুলে দাও এবং আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দান কর।" (আল আরাফঃ ১২৬)[২] এভাবে, যারা এক সময় ছিলেন জাদুকরী কুফফার তারা পরে ধর্মভীরু শুহাদায় পরিণত হন।

জেনে রাখুন, এটা তেমনই, যেমন সত্যাশ্রয়ী, বিশ্বস্ত রাসূল ﷺ সকল সৃষ্টির রবের বার্তা আমাদেরকে জানিয়ে বলেছেন, "যদি সকল মানুষ তোমার কল্যাণের জন্য জড়ো হয়, তারা তোমার কোন কল্যাণ করতে পারবে না, শুধু তা ব্যতীত যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন, আর যদি সকল মানুষ তোমার অকল্যাণের জন্য জড়ো হয়, তারা তোমার কোন অকল্যাণ করতে পারবে না, শুধু তা ব্যতীত যা আল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে নির্ধারণ করে রেখেছেন"। [ইবন আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আহমেদ, আত-তিরমিযী] তিনি ﷺ আরও বলেন, " জেনে রাখ, বিজয় আসে সবরের সাথে, কষ্টের সাথে আসে স্বস্তি আর কাঠিন্যের সাথে সহজতা"। [ইবন আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আহমেদ]

এখানে আমি আলোচনার কেন্দ্রে তা আনতে চাই যা অভিজ্ঞতা ও আছারের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায়। এটা হল যুদ্ধের ময়দানে শত্রুকে মোকাবিলার সময় নেতৃত্বের অবিচল দৃঢ়তার ব্যাপক প্রভাব।জনৈক ব্যক্তি আল বারাকে জিজ্ঞেস করেন, "হে আবু উমারাহ, আপনি কি হুনায়নের যুদ্ধের দিন পশ্চাদপসরণ করেছিলেন?" তিনি জবাবে বলেন, "যদি জানতে চাও রাসূল ﷺ এর ক্ষেত্রে, তিনি পশ্চাদপসরণ করেন নি। আবু সুফিয়ান ইবন আল হারিছ তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে ছিলেন। আর যখন মুশরিকগণ তাঁকে ঘিরে ফেলে তিনি অবতরণ করে বলেন, "আমি নবী -মিথ্যা নয়- আমি ইবন আব্দিল মুত্তালিব"। (বুখারী ও মুসলিম) এই হাদিসে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে যা এই পথকে আলোকিত করে।

প্রথমত, নেতৃত্ব ছিলো যুদ্ধের ময়দানে ঠিক যেখানে যুদ্ধ হচ্ছিল, এমন নয় যে লড়াই ক্ষেত্র থেকে বহু দূরে ছিল। তা এক দেশ থেকে আরেক দেশে পালিয়ে বেড়ায় নি, এই দাবী করে যে তা হলো শুধুমাত্র "প্রতীকী", আর এর সমাপ্তি হলে (অর্থাৎ প্রতীকী নেতা নিহত বা গ্রেফতার হলে) দাওয়াহও থেমে যাবে। এর ফলে, ন্যূনতম ভাইদের নিকট যা অনুরোধ করি তা হল, এক উলাইয়ার আমির তার উলাইয়ার মাঝে, এক এলাকার আমির তার এলাকার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবেন। একইভাবে, কাতিবাহর (ব্যাটালিয়ন) আমির অথবা সারিয়্যার (স্কোয়াড) আমির তার অধীনস্থ সৈন্যবাহিনীর সাথে অবস্থান করবেন। কেউ তা

২ এগুলো অনুতপ্ত, ফেরাউনের পূর্ববর্তী যাদুকরদের কথা।

করতে অপারগ হলে তার নেতা হওয়া উচিত না, তার সকল যোগ্যতা থাকুক না কেন, যেহেতু সিংহ অন্যের শিকারে বস্তু ভক্ষণ ব্যতীত কখনো তার নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে গিয়ে শিকার করে না।

দ্বিতীয়ত, তার কথা, "তিনি তার খচ্চরের লাগাম ধরে ছিলেন" অর্থাৎ, আমিরের মাধ্যমে দৃঢ়তা প্রকাশ পেতে হবে এবং তার আমলে তা ফুটে উঠতে হবে। এখানে যে দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় তা হল, এরকম মারাত্মক অবস্থায়ও রাসূলুল্লাহ ﷺ খচ্চরের মত ধীরলয়ের একটি প্রাণীর ওপর বসে ছিলেন। ইবন কাছির ﷺ বলেন, "এটা ছিল চরম সাহসিকতার সর্বোচ্চ নজির। এরকম এক দিনে যুদ্ধের ডামাডোলে যখন তার বাহিনী তাঁকে উন্মুক্ত রেখে যায়, তখনো তিনি শ্লথ গতিসম্পন্ন খচ্চরে বসেছিলেন, যা আক্রমণ, পশ্চাদপসরণ ও পলায়নের জন্য অনুপযুক্ত। তদুপরি, তিনি তাদের দিকে এগিয়ে যান, স্বীয় নাম উচ্চারণ করেন যেন তারা তাঁকে চিনতে পারে। আল্লাহর শান্তি ও রহমত কিয়ামত পর্যন্ত চিরকাল তাঁর উপর বর্ষিত হোক"। (আত তাফসীর)

ইবন আল বাত্তাল হতে বর্ণিত আছে, আল মুহাল্লাব বলেন, "এই হাদিস হতে দেখা যায় যে, ইমাম যুদ্ধের সময় খচ্চরের পিঠে বসে আছেন, যা তাঁর দৃঢ়তার পরিচয় বহন করে, এর ফলে তার পালিয়ে যাওয়ার বা পশ্চাদপসরণের আশংকা নেই। এটা সৈন্যদের মনোবলের ওপরও প্রভাব ফেলে, কারণ তিনি দৃঢ় থাকলে তার সৈন্যরাও দৃঢ় থাকবে, আর যদি দেখা যায়, তিনি দৃঢ় থাকতে বদ্ধপরিকর, তবে সৈন্যরাও তাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হবে"। (শারহ সহীহ আল বুখারী)

উপরোক্ত বক্তব্য সমূহ থেকে একটা উপকারিতা যা এটা থেকে প্রতীয়মান হয় তা হল, আমিরের জন্য উপযুক্ত নয় যে, তিনি এমন কোন বাহনে চড়বে যা অন্যান্য সাধারণ সৈন্যদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী ও দ্রুত গতিসম্পন্ন -কম শক্তিশালী না হলেও- এতে করে সৈন্যদের হৃদয়ে দৃঢ়তা থাকবে আর তাদের মনে কোন সংশয় কাজ করবে না, বিশেষত যদি তার বাহনের খরচ জিহাদের অর্থ থেকে ব্যয় করা হয়।

তৃতীয়ত, তাঁর নিজের পরিচয়দান মূলক উদ্ধৃতি, "আমি নবী -মিথ্যা নয়- আমি ইবন আব্দিল মুত্তালিব" ভেবে দেখা উচিত। যেহেতু যুদ্ধ তীব্রতর হয়, সেখানে যারা ছিল শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল, এমনকি অবস্থার ভয়াবহতা ও (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) প্রবল গতিতে পলায়নের কারণে কোন ব্যক্তি তার আপন ভাইকে চিনতে পারছিল না, তখন তাঁর জন্য জরুরী ছিল সৈন্যদের এবং যারা তাঁকে ভালবাসে তাদেরকে অবগত করানো যে, তিনি তখনো সেখানে বর্তমান এবং তিনি পালিয়ে

যান নি। নিরাপত্তা ব্যবস্থা আর সামরিক সাবধানতা অবজ্ঞা করে প্রকাশ্যে তিনি ঘোষণা দেন, যেহেতু সময় ও স্থান সেই ব্যবস্থার উপযুক্ত ছিল না এবং এরকম সংকটাপন্ন অবস্থায় ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার আর দৃঢ়তার প্রয়োজন ছিল।

আশ্চর্যের বিষয় হল, অন্যত্র জিহাদের কতিপয় আমির যুদ্ধ তীব্রতর হলে এবং শত্রুগণ তার এলাকা দখল করে সৈন্যদের কতল করা শুরু করলে গা ঢাকা দেয়, তার কোন সৈন্যের সাথে যোগাযোগ করে না, তার নাম এবং কোন ক্ষেত্রে তার চেহারাও পাল্টায়, এই দাবি করত যে ভাল নেতৃত্ব সংরক্ষণ করা উচিত, যদিও সে নিজে আর তার ভাইগণ পরাজিত হয়েছে। যদি সে দৃঢ় থাকত, তার সৈন্যদেরকে পরিচয় দিত, তার শত্রুর মোকাবিলা করত এবং সবর ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করত, স্বয়ং ও যাদের ওপর সে নিযুক্ত হয়েছিল তারা পরাজয়ের পরিবর্তে পরিত্রাণ লাভ করত।

চতুর্থত, আল আব্বাস ﷺ বলেন যে, রাসূল ﷺ বলেন, "হে আব্বাস, সামুরার লোকদের ডাক"[৩] ফলে, আল আব্বাস যার গলার আওয়াজ ছিল উঁচু, জোড় গলায় ডাকলেন, "কোথায় সামুরার লোকেরা? আল আব্বাস বলেন, "আল্লাহর শপথ, তারা যখন আমার গলার আওয়াজ পেল, পশুর পাল যেমন বাচ্চার দিকে ছুটে যায় সেভাবে একত্রে চলে আসল আর তারা বলল, "এই আমরা, আপনার সেবায় হাজির"। (মুসলিম) ইবন ইসহাক যোগ করেন যে এক ব্যক্তি উট সহ আসতে চাইল, কিন্তু সম্ভব না হওয়ায় তিনি যুদ্ধাস্ত্র ফেলে শুধু তলোয়ার আর চামড়ার তৈরি বর্ম নিয়ে আওয়াজের দিকে ছুটে আসেন। (সিরাহ ইবন হিশাম) আত তাবারী বলেন যে, রাসূল ﷺ আল আব্বাসকে বলেন, "আনসারদের ডাকো আর মুহাজিরদের ডাকো"। ফলে তিনি আনসারদের গোত্র ধরে ধরে ডাকতে লাগলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "যারা সুরা বাক্বারাহ মুখস্থ করেছে তাদেরকে ডাকো"। ফলে তিনি ডাকলেন, " হে, সুরা বাক্বারাহ মুখস্থ কারী" এরপর তারা সকলে আসলেন। (আত তাফসীর)সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, বনী আল হারিছ ইবন আল খাযরাজদের শেষ আহবান করা হয়েছিল।

এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও নববী মহান দৃষ্টান্ত রয়েছে। রাসূল ﷺ এই আমল করেন যখন লোকজন পালাচ্ছিল আর বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল, এমনকি তাঁর সাথে মাত্র বারো জন সঙ্গী ছিলেন বা -অন্য বর্ণনা মতে-

৩ "সামুরাহ" এক ধরনের বৃক্ষ (Acacia tortilis), যা ছাতা বৃক্ষ নামেও পরিচিত) যার নিচে সাহাবাগণ আল্লাহর রাসূলের ﷺ নিকট বাইয়াতে রিদওয়ানের সাক্ষ্য প্রদান করেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল।" (সুরা ফাতহ: ১৮)

বড় জোড় আশি জন। বীর যোদ্ধা সালামাহ ইবন আবি আকওয়া ও বাইয়াতে রিদওয়ানের সেরা বান্দাগণ ও অন্যান্যরা সহ মুসলিম বীরগণ নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে সেনাপতি হতাশ হয়ে যান নি। তিনি আশাহত হন নি। তিনি তরবারি ছুঁড়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান নি। এরকম করা থেকে তিনি পবিত্র।বরং, তিনি দৃঢ় ছিলেন এবং লোকদের সেই নাম ধরে ডাকতে থাকেন যে নামে তারা পরিচিত ছিলেন। তিনি তাদের দিয়ে শুরু করেন যারা ছিলেন ঈমানে দৃঢ়, একনিষ্ঠ সেনা এবং সবচেয়ে ধর্মপরায়ণ বান্দা: যারা বাইয়াতে রিদওয়ানের গাছের নিচে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। এরপর তিনি কুরআনের লোকদের ডাকতে থাকেন, যারা কুরআন ধারণ করেছিলেন, বিশেষত সুরা আল বাক্বারাহ মুখস্থ করেছিলেন। অতঃপর যখন তারা তাঁর চারপাশে জড়ো হলেন, তিনি আনসারদের গোত্র ধরে নাম ডেকে বিশ্বাসীদের হৃদয়ে গোত্র চেতনা জাগিয়ে তুললেন। ফলে, যারা পালানোর পাঁয়তারা করছিলেন তারা অপমানের ভয় ভীত হলেন। রাসূল ﷺ এরূপ করেন, যদিও তিনি জানতেন যে বাইয়াতে রিদওয়ানের এবং সুরা আল বাক্বারাহ মুখস্থকারীদের ইতিমধ্যে ডাকা হয়েছে। ফলে, তিনি সেরাদের মধ্যে সেরাদের দিয়ে শুরু করেন, তারপর পর্যায়ক্রমে অন্যদের আহবান করেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যুদ্ধ থেকে পলায়নের গুনাহ এবং গুরুতর অপরাধ স্বত্বেও, যা গুনাহগারকে ধ্বংস করে দেয় এবং সে পরে আর কোন দিন তাওবাহ নাও করতে পারে, রাসূল ﷺ যারা পালিয়ে গিয়েছিল তাদের ভর্ৎসনা করেন নি, আর না তাদের অপমান করেছিলেন বা অভিসম্পাত করেছিলেন। বরং, তিনি তার বিপরীত করলেন। জিহাদ এবং তাওহীদে অগ্রগামীতার দরুন তাদের গোত্রের নাম ধরে ডেকে তাদের সম্মান করলেন। এ থেকে দেখা যায়, কঠিন পরিস্থিতিতে আমিরের উচিত -আল্লাহর পরে- অগ্রগামী মুজাহিদীনদের ওপর আস্থা রাখা, তারপর, তাদের পরে সম্ভ্রান্ত গোত্রের সন্তানদের ওপর আস্থা রাখা। তাদের কাউকে অবমাননা করার ক্ষেত্রে তাকে অনেক সাবধান থাকতে হবে। অধিকন্তু, যারা জিহাদ ত্যাগ করেছে তাদের সবার সঙ্গে আমিরের যোগাযোগ রাখতে হবে এবং আল্লাহর রাহে পূর্বে তার জিহাদের ভূমিকার কথা স্মরণ দিতে হবে, তাকে ভাইদের সারিতে ফিরিয়ে আনতে হবে, যেহেতু জিহাদ ত্যাগকারীকে এভাবে ছেড়ে দিলে সে শয়তান ও এর মিত্রের শিকারে পরিণত হবে এবং এর ফলে মুসলিম সৈন্যদের জন্য জিহাদে পরাজয়ের খেসারত দিতে হবে। আর কোন বিবেকবান লোক তা মেনে নিবে না।

পঞ্চমত, কে হুনায়নের যুদ্ধের দিন পালিয়েছিল তা জানার আরেকটা ভাল দিক আছে। আনাস ﷺ হতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, উম্ম সুলায়ম হুনায়নের যুদ্ধের দিন হাতে খঞ্জর নিয়ে বলেন, "হে রাসূল ﷺ, আমি কি তুলাকাদের,

যারা আমাদের পরে (ইসলামে) এসেছে, তাদের কতল করব? তারা হুনায়নের দিন আপনার নিকট থেকে পলায়ন করে"। ফলে, রাসূল ﷺ বলেন, "হে উম্ম সুলায়ম, মূলত, আল্লাহই (আমাদের জন্য) যথেষ্ট ও উত্তম"। আনাস ﷺ হতে বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ এর সাথে হুনায়নের যুদ্ধের দিন দশ হাজার যোদ্ধা ছাড়াও তুলাকাগণ ছিল, যারা পরে পালিয়ে যায়। আন নববী ﷺ বলেন, "তুলাকাগণ হল সেইসব মক্কাবাসী যারা মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাদের সেরূপ বলা হত, কারণ রাসূল ﷺ তাদের মুক্ত করে দেন। কিন্তু তাদের ইসলাম ছিল দুর্বল, তাই উম্ম সুলায়ম i মনে করেন যে, তারা ছিল মুনাফিক এবং যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে তারা হত্যা যোগ্য অপরাধ করেছে"। (শারহ সহীহ মুসলিম)

যা ইতিপূর্বে ঘটেছে তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, হুনায়নের যুদ্ধের দিন তুলাকাগণ প্রথম পালিয়ে যায়, যা মুসলিম বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে এবং বিশ্বস্ত ও সাহসী মুসলিমদের অন্তরে ভীতির উদ্রেক করে, পরবর্তীতে তারাও তদ্রূপ পালিয়ে যায়। প্রশ্ন হল, তুলাকাগণ যারা ইসলামে নতুন, যাদের ইসলাম তখনো দুর্বল আর যাদের তিনি ﷺ তৌহীদের ওপর বিশেষ "কোর্স" নেন নি, তাদেরকে তাঁর সঙ্গে হুনায়নের যুদ্ধের দিন আনয়ন করে রাসূল ﷺ কি কোন ভুল -তিনি তা থেকে মুক্ত- করেছিলেন? তাওহীদে তাদের নব দীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়, যখন রাসূল ﷺ হুনায়ন অভিমুখে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে মুশরিকদের কাছে পবিত্র একটি গাছের নিকট দিয়ে যান, যা "যাত আনওয়াত" নামে পরিচিত ছিল, যার সাথে তারা তাদের অস্ত্র সমূহ ঝুলিয়ে রাখতো। তুলাকাগণ বলে, "হে রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাদের যেমন যাত আনওয়াত আছে আমাদের জন্যেও একটা যাত আনও-য়াত নির্ধারণ করে দিন"। রাসূল ﷺ বলেন, "সুবহান আল্লাহ, এটা হল এমন কথা, ঠিক মুসা ﷺ এর লোকেরা দাবি করেছিল, "হে মুসা, আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন।" (আরাফ: ১৩৮) [আবু ওয়াকিদ আল লায়ছি হতে বর্ণিত, আত তিরমিযী] [৪]

আমি এটা এজন্য উল্লেখ করছি, যেহেতু দাওলাতুল ইসলাম (ফিল ইরাক) ঘোষণার পর বহু লোক আমাদের বাহিনীতে যোগ দেয় এবং তাদের কয়েক-

৪ শায়খ এখানে বলতে চাইছেন তুলাকাদের তখনো ছোট শিরক এবং তৌহীদের সাথে সাংঘর্ষিক অন্যান্য বিষয়ে সংশোধনের প্রয়োজন ছিল, এমন নয় যে, তাদের ইসলামের ভিত্তি ও এর সত্যতা কিংবা বড় শিরক বর্জন করে কিভাবে শুধু আল্লাহর ইবাদত করতে হবে তা বোঝার বাকি ছিল। তারা মক্কী ছিলেন, আরবিতে তাদের ভাল দখল ছিল, তারা "লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ"এর যথার্থ অর্থ জানতেন এবং বিশ বছরেরও অধিক সময় রাসূল ﷺ এর দাওয়াহ পেয়েছিলেন, তাই সন্দেহাতীতভাবে তারা বড় শিরকের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ছিলেন। রাসূল ﷺ যে তাদের অনুরোধের তুলনা করেছেন -মুশরিকদের অনুকরণে গাছে অস্ত্র ঝুলিয়ে নেয়ামত লাভের আশার ব্যাপারে, আল্লাহ যা অনুমোদন করেন নি- বনী ইসরাইলের বাছুর পূজার সাথে,

জন কিছু স্থানে ভাইদের পরাজয়ের কারণ ছিল, এর ফলে কিছু দুর্বল আত্মার অধিকারী আমাদের মাঝে দোষ খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু আমরা রাসূল ﷺ এর অনুসরণ ব্যতীত বেশি কিছু করি নি। বরং, বুখারী ও অন্যদের বর্ণনা অনুযায়ী, আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁকে বিজয় দান করেন, রাসূল ﷺ তুলাকাগণ ও মুহাজিরীনদের পুরস্কৃত করেন, তাদের অবারিতভাবে দান করেন এবং আনসারদের কিছু না দিয়ে তাদের মাঝে গণিমত বণ্টন করে দেন, যদিও আনসারগণ ছিলেন বাহিনীর বড় অংশ। ইবন আল ক্বাইয়্যিম ﷺ বলেন, "(আল্লাহর) হিকমতের অংশ হল (হুনায়নের দিন পরাজয় নির্ধারণের মাধ্যমে) এটা নিশ্চিত করা যে, আল্লাহ ﷻ তার রাসূলকে বিভিন্ন গোত্র থেকে আগত ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যাধিক্য দ্বারা অথবা তার সমগোত্রীয় লোকদের তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে সাহায্য করেন নি"। (ফাতহ আল বারী)

এর বাইরে আমরা উম্মাহকে এই সুসংবাদ দিতে চাই যে, দাওলাতুল ইসলাম (ফিল ইরাক) ঘোষণার পর এ পর্যন্ত কোন আমির অস্ত্র পরিহার করেন নি, আলহামদুলিল্লাহ। বরং, আজ অবধি তারা তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় বীর যোদ্ধা আর সংগ্রামের অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে আসছেন। আর সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক।

তা মূলত কারও এহেন উক্তির, "আল্লাহ এবং আপনি যা চান" জবাবে তাঁর এই কথার সাথে তুলনীয়, "তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমান করছ?" বরং বল, "আল্লাহ একা যা চান"। [ইবন আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আহমেদ] তারা রিদ্দা করেন নি এবং তা একারণে নয় যে, "অজ্ঞতার অজুহাতে" বড় শিরক হতে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত ছিলেন; বরং তারা রাসূল ﷺ এর নিকট একটা বৃক্ষ নির্ধারণের দাবি করেছিলেন, যাতে তারা অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখবে, এই আশায় যে, তাঁর দু'আর ফলে তা বরকতপ্রাপ্ত হবে, যেমন করে আল্লাহ পাক অন্যান্য কতিপয় বিষয়ে বরকত প্রদান করেছেন- যমযম,মক্কা, রামাদান ইত্যাদি। কিন্তু যেহেতু তাদের অনুরোধ ছিল মুশরিকদের অনুরূপ যাদের অবশ্যই অনুকরণ করা উচিত না এবং যেহেতু একটা পর্যায় পর গাছের উপাসনা করা হবে, তাই তিনি তাদের তীব্র ভর্ৎসনা করেন। এই হাদিস হতে এমন কোন দলীল পাওয়া যায় না যে, কেউ "অজ্ঞতাবশত" আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করলে বা রাসূল ﷺ কে অবমাননা করলে পরে তাকে মুসলিম বলে গণ্য করা হবে। অজুহাত হিসেবে অজ্ঞতার এরকম বাড়াবাড়ি রকম ধারণা দাবিকের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে খণ্ডন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, দেখুন, দাবিক, ইস্যু-৮, "ইরজা-সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিদআত"।

পঞ্চম পথ

বিজয়ের পঞ্চম পাথেয় হল প্রস্তুতি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তাদের জন্য তোমরা সাধ্যমত শক্তি অর্জনের প্রস্তুতি গ্রহণ কর।" (আল আনফাল: ৬০) "আদওয়া আল বায়ান" এর লেখক বলেন, "শক্তি সামর্থ্য অর্জনের জন্য এটা হল এক চূড়ান্ত বিধান, পরিণামে কত আধুনিক মানের শক্তি অর্জন সম্ভব হল সেটা মুখ্য বিষয় নয়। সুতরাং, এক্ষেত্রে দুনিয়রী উন্নতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য এটা হল এক অবধারিত নির্দেশ।"

এটা সর্বজনবিদিত যে, বর্তমানে জিহাদ প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরযে আইন। কোন ফরযে আইন পালনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করাও ফরয। রাসূল ﷺ বলেন, "নিক্ষেপ কর, হে বনি ইসমাইল, কারণ বস্তুত তোমাদের পিতা ছিলেন নিক্ষেপকারী" (বুখারী, সালামাহ ইবন আকওয়া হতে বর্ণিত) তিনি ﷺ আরও বলেন, "বস্তুত, নিক্ষেপই হল শক্তি" । (মুসলিম, উকবাহ ইবন আমির হতে বর্ণিত) আস সান'আনি পূর্ববর্তী হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, "এই হাদিস আয়াতে উল্লিখিত শক্তির ব্যাখ্যা প্রদান করে, যার অর্থ হল 'তীর নিক্ষেপ', আর রাসূল ﷺ এর সময় তাই ছিল এর প্রচলিত অর্থ। এই শক্তির অন্তর্গত হল মুশরিক ও জালেমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ বা গুলি বর্ষণ।" (সুবুল আস সালাম) সংক্ষেপে, ক্রুসেডার ও মুরতাদ শত্রুদের বিরুদ্ধে বর্তমান যুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করা জিহাদ করতে সক্ষম প্রত্যেক মুসলিমের ওপর আবশ্যক।

এখানে আমি কিছু পয়েন্ট তুলে ধরব:

প্রথমত, আবু জাফর আল তাবারী ﷺ আল্লাহ তায়ালার এই আয়াতের "তোমাদের সাধ্যমত" এই অংশের ব্যাখ্যায় বলেন, "তোমাদের পক্ষে যা কিছু অস্ত্র যোগাড় সম্ভব তা করা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের শক্তি অর্জনের মাধ্যম।" (জামি আল বায়ান) অনুরূপভাবে, অস্ত্র উৎপাদন আল্লাহর পথে জিহাদের ক্ষেত্রে অন্যতম সহায়ক অবদান রাখে।বর্তমানে এই অস্ত্র উৎপাদনকে বলা হয় "যুদ্ধ শিল্প"। আল্লাহ তায়ালা তার কিতাবের একাধিক জায়গায় এই শিল্পের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বেশ পরিষ্কারভাবেই বলেন, "আমি তাঁকে তোমাদের জন্যে 'লাবুস' তৈরি করা শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে?" (আল-আম্বিয়া: ৮০) আত তাবারী বলেন, "আরবদের নিকট 'লাবুস' হল যেকোন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র, যেমন- লৌহ বর্ম, বক্ষে

পরিধান যোগ্য বর্ম, তরবারি বা বর্শা"। ইবন কাছির বলেন, "(আল্লাহ তায়ালা তাকে) যুদ্ধ বর্ম তৈরি করার নিয়ম শেখান"।

শক্তি ও প্রতাপের মালিক আল্লাহ বর্ম তৈরি করার বর্ণনা দিয়ে বলেন, "প্রশস্ত বর্ম তৈরি কর, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর" (সাবা: ১১) অর্থাৎ লম্বা ও চওড়া বর্ম। "কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর" প্রসঙ্গে 'আদওয়া আল বায়ান' এর লেখক বলেন, "যথাযথ মাপ নিয়ে দৃঢ় সংযুক্তি সহকারে বর্ম তৈরি করা ।"

কাতাদাহ হতে ইবন কাছির বর্ণনা করেন, বর্ম হত মসৃণ, পাতলা পাতের ন্যায় আর দাউদ ﷺ প্রথম কড়ায় কড়ায় সংযুক্তি সহকারে বর্ম তৈরি করেন।

এ থেকে দেখা যায়, বর্ম তৈরির ক্ষেত্রে এতখানি আসমানী গুরুত্ব ও নজর প্রদান করা হয় যে, আল্লাহ তায়ালা তা সবিস্তারে বর্ণনা করেন এবং বান্দাকে এই মহান অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, "তাই তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না?"। দুঃখজনক হলেও সত্য, অনেক মুজাহিদিন, যদি অধিকাংশ নাও হয়, শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত আমাদের যুদ্ধে এ সম্পর্কে মনযোগী নন। বহু উপ-কারিতা স্বত্বেও শত্রুর বুলেট আর বোমার আঘাত থেকে মুজাহিদের জীবন -যা আমাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয়- প্রতিরক্ষা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় উপকারিতা হল, সংকটাপন্ন এলাকায় আহত হওয়া থেকে মুজাহিদকে নিরাপদে রাখা, যা ব্যতীত সে জিহাদ চালিয়ে যেতে অপারগ হবে কিংবা অচেতন অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে উন্মুক্ত ভাবে পড়ে থাকবে এবং পরবর্তীতে শত্রুগণ কর্তৃক বন্দী হিসেবে ধৃত হবে।

তৃতীয় উপকারিতা হল, মুজাহিদ শত্রুর নিকটবর্তী অবস্থানে যাওয়ার সুযোগ পাবে। যারা শত্রুর অবস্থান গুড়িয়ে দিতে চায় আর যেসব সিংহ পুরুষ ইসতিশ-হাদী অভিযান চালায় তাদের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

পরিশেষ, আরও যে উপকারিতা লক্ষণীয় তা হল, আমরা কেউই রাসূল ﷺ এর চেয়ে বেশি সাহসী নই, অথচ তিনি লৌহ বর্ম ও হেলমেট পড়তেন আর তিনি সঙ্গে তরবারি রাখতেন। আইশা i বলেন, " রাসূল ﷺ ওফাতের পূর্বে বর্ম বন্ধক রেখে জনৈক ইহুদীর নিকট হতে তিরিশ একক ওজনের যব ধার করেন"। (বুখারী) এটা প্রমাণিত যে, ওহুদের দিন রাসূল ﷺ দুটি বর্ম পরিধান করেন, একটির ওপর আরেকটি। (আহমাদ ও আবু দাউদ, আস সাইব ইবন ইয়াজিদ হতে বর্ণিত) অনুরূপভাবে, আনাস বিন মালিক ﷺ বর্ণনা করেন যে,

মক্কা বিজয়ের বছর রাসূল ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি হেলমেট পরিহিত অবস্থায় ছিলেন"। (বুখারী ও মুসলিম)

অধিকন্তু, শক্তি ও প্রতিপত্তির মালিক আমাদের ধাতব পিণ্ড হতে বর্তমানে অস্ত্র তৈরির নীতি শিক্ষা দিয়েছেন। যুল কারনাইনের ঘটনায় তিনি বলেন, "তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেনঃ তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন তিনি বললেনঃ তোমরা গলিত তামা নিয়ে এস, আমি তা এর উপরে ঢেলে দেই।" (আল কাহফ: ৯৬)

সম্প্রতি জানা গেছে যে, লোহার সাথে সামান্য কপারের সংমিশ্রণে উদ্ভূত সংকরের শক্তি, প্রতিরোধ ও কাঠিন্য বাড়ে এবং লোহাকে শক্ত করণে এটা সবচেয়ে ভাল উপায়।

এছাড়াও, আল্লাহ তায়ালা নুহ ﷺ কে নৌকা তৈরির নিয়ম শেখান। তিনি বলেন, " আর আপনি আমার সম্মুখে আমারই নির্দেশ মোতাবেক একটি নৌকা তৈরি করুন।" (হুদ: ৩৭) আত তাবারী ইবন আব্বাস ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, "তিনি জানতেন না কিভাবে নৌকা তৈরি করতে হয়, তাই আল্লাহ তাকে পাখির বুকের আদলে নৌকা তৈরি করতে অনুপ্রাণিত করেন", রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উম্মাহর যে সকল যোদ্ধা জাহাজে চড়ে হামলা করেছেন তাদের প্রশংসা করেছেন, যেমনটা উম্ম হারামের i হাদিস হতে পাওয়া যায় । (বুখারী ও মুসলিম) তাই এমন কিছু তৈরি করার জন্য কেউ কি আছে?

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, "অতঃপর আল্লাহ তাদের চক্রান্তের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন। এরপর উপর থেকে তাদের মাথায় ছাদ ধ্বসে পড়ে গেছে।" (আন নাহল: ২৬) যেকেউ বিস্ফোরক এবং এর ব্যবহার বিধি জানে তারা সকলেই স্বীকার করবে যে, এই আয়াতটিতে বিস্ফোরক দিয়ে ধ্বংস সাধনের মূলনীতি রয়েছে।

এছাড়াও, যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ করার ন্যায় আর কোন শিল্পকে এত উৎসাহিত করা হয় নি। যেমন রাসূল ﷺ বলেন, "একটি তীরের কারণে তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে: একজন যে তা তৈরি করল এই আশায় যে তা ভাল কাজে ব্যবহৃত হবে, একজন যে তা ছুঁড়ল আর একজন যে তা ছোঁড়ার জন্য (নিক্ষেপকারীকে) দিল"। (ইবন মাজাহ, আবু দাউদ, তিরমিযী, আন নাসাই, উকবাহ ইবন আমির হতে

বর্ণিত) তাহলে যে রকেট বা বিমান তৈরি করে কিংবা কোন বিস্ফোরক উদ্ভাবন করে তার কতখানি মর্যাদা?

আর মিডিয়া সংক্রান্ত প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বলতে গেলে, বর্তমানে মুজাহিদ ও তাদের শত্রুদের মাঝে বিরাজমান যুদ্ধ দুটি অক্ষের চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে। প্রথমত, সামরিক যুদ্ধ, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে আর দ্বিতীয়ত, শয়তানী মিডিয়া মোকাবিলা করা, যা উম্মাহর পরিচয়কে বিকৃত করেছে, আক্বিদাহ ও মূল্যবোধকে কলুষিত করেছে এবং হীনমন্যতাবোধ আর মানসিক পরাজয়কে উচ্চে তুলে ধরেছে। আসলেই মিডিয়া কর্তৃক যে বোমা বর্ষণ করা হয়, তা উম্মাহ ও তার লোকদের জন্য যুদ্ধবিমান হতে নিক্ষিপ্ত আগ্নেয় বোমার চেয়ে অধিকতর বিষাক্ত ও ক্ষতিকর।

তাই এটা যথোচিত যে, মুজাহিদগণ -যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা সামরিক দিক থেকে শত্রুপক্ষের শক্তি দমন করার তৌফিক দিয়েছেন- অন্য ফ্রন্টেও অর্থাৎ মিডিয়া ফ্রন্টেও তাদের মোকাবিলা করুক।

রাসূল ﷺ বলেন, "মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহ্বা দিয়ে জিহাদ কর।" (আহমাদ, আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত) তিনি ﷺ আরও বলেন, "বস্তুত ইমানদারগণ তাদের তরবারি এবং জিহ্বা দিয়ে জিহাদ করে। যার হাতে আমার প্রাণ, এটা এমন যেন (মুখের দ্বারা) এক গাদা তীর ছুঁড়ছো। (আহমাদ, কাব ইবন মালিক হতে বর্ণিত) রাসূল ﷺ তাঁর সময়ের সবচেয়ে উপযোগী মিডিয়া প্রয়োগ করতেন, যা ছিল কাফিরদের হৃদয়ের প্রতি সবচেয়ে কঠোর: আর তা হলো কবিতা। আত তিরমিযী ও আন নাসায়ী আনাস বিন মালিক হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ উমরাহ আল কাযা আদায়ের জন্য মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা তাঁর সামনে এই বলে হাঁটছিলেন:

হে কাফিরের সন্তানগণ, তাঁর পথ ছেড়ে দে,
তাঁর প্রতি নাজিলকৃত ওহীর কারণে আজ আমরা আঘাত হেনেছি-
হ্যাঁ, এমন এক আঘাত, যার দরুন তাদের মাথা হতে ঘাড় বিচ্ছিন্ন হবে
প্রিয়ভাজন তার প্রিয়জনকে ভুলে যাবে।

উমর ﷺ বলেন, "ইবন রাওয়াহা, তুমি রাসূল ﷺ এর সামনে আল্লাহর হারামে কবিতা পাঠ করছ?" ফলে রাসূল ﷺ তাঁকে বলেন, "ওমর, ওকে বলতে

দাও। কারণ (কথাগুলো) এক গাদা তীরের চেয়ে দ্রুত তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে"।

বীর সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের ইসলাম গ্রহণে রাসূল ﷺ যেমন খুশি হয়েছিলেন, তেমনি জনৈক বিখ্যাত কবির ইসলাম গ্রহণে রাসূল ﷺ আনন্দিত হয়েছিলেন। যখন আকাবাহ'র বায়াহ প্রদান করতে আনসারদের প্রতিনিধি আগমন করেন, তিনি ﷺ ইবন আব্বাসকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি এই দুইজনকে চেন?" তিনি ঘুরলেন এবং জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, ইনি আল বারা ইবন মারুর, যিনি তার গোত্র প্রধান আর ইনি হলেন কাব ইবন মালিক"। কাব বলেন, "আল্লাহর কসম, আমি রাসূল ﷺ এর এই কথা ভুলব না, যখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কে, কবি?' ইবন আব্বাস জবাবে বললেন,'হ্যাঁ'"। (আহমাদ) বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ তাঁর কবিদের ভালভাবে প্রশিক্ষণ দিতেন। একবার তিনি হাসসান বিন ছাবিতকে বলেন, "আবু বকরের নিকট যাও এবং তাঁর কাছ থেকে মানুষের খুঁত বা গলদ সম্পর্কে শিক্ষা লাভ কর, কেননা সে বংশবিদ্যায় পারদর্শী"। (আল বায়হাকীঃ লুবাব আল আনসাব) কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের (কুরাইশদের) অপমানিত করার জন্য রাসূল ﷺ এর নিকট হাসসান অনুমতি চাইলে জবাবে তিনি বলেন, "আমার বংশকুলের কি হবে?" হাসসান বলেন, "আমি আপনাকে তাদের থেকে সেভাবে ছাড়িয়ে আনব যেভাবে মন্ড থেকে চুল বের করে আনা হয়।" [বুখারী, আইশা ﷺ থেকে বর্ণিত] রাসূল ﷺ ভাল কবিতা পছন্দ করতেন। তিনি বলেন, "কোন কবি কর্তৃক কথিত সবচেয়ে সত্য বচন হল লাবিদের এই বাণী, 'হায়, আল্লাহ ব্যতীত কোন সাহায্যকারী নেই' আর উমাইয়া ইবন আবিস সালত প্রায় ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছিলেন। [বুখারী ও মুসলিম, আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত]

একইভাবে, তিনি ছাবিত ইবন কায়েস আস শাম্মাসকে - যিনি জান্নাতের সুসংবাদ লাভকারীদের একজন - ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষে বলার জন্য মুখপাত্র হিসেবে নিযুক্ত করেন। যখন বনী তামিম গোত্র তাদের কবি ও মুখপাত্র নিয়ে হাজির হয়, তখন রাসূল ﷺ ছাবিত ইবন কায়েসকে বললেন, "দাঁড়াও এবং তার জবাব দাও"। ছাবিত জবাবে সাড়া দিলেন। এর ফলে আল আকরা ইবন হাবিস বলেন," আসলেই, মুহাম্মাদ সাহায্যপ্রাপ্ত। আল্লাহর কসম, আমি বুঝি না। আমাদের মুখপাত্র কথা বলল কিন্তু তাদের মুখপাত্র বেশি ভাল কথা বলল আর আমাদের কবিও কবিতা পাঠ করল কিন্তু তাদের কবি অধিকতর কাব্য প্রতিভা সম্পন্ন এবং তার কথা অধিক খাঁটি। অতঃপর তিনি রাসূল ﷺ এর নিকট এসে বললেন, "আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই আর আপনি

আল্লাহর প্রেরিত রাসূল" (মারিফাত আস সাহাবাহ, জাবির ইবন আব্দুল্লাহ হতে আবু নুয়াইম কর্তৃক বর্ণিত)

ইসলামিক মিডিয়ার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আমরা সারসংক্ষেপে নিম্ন বর্ণিত পয়েন্টে সন্নিবেশিত করতে পারি:

১। মুসলিমদের সম্মান ও আক্বিদাহ সংরক্ষণ করা। আল্লাহ তায়ালা কবিদের (সাধারণভাবে যাদের নিন্দা করা হয়) ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করেন এই বলে যে, "তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ কে খুব স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।" (আশ শু'আরা: ২২৭) ইবন আব্বাস বলেন, "এর মানে হল, তারা কুফফারদের জবাব দেন যারা ইমানদারদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটায়। (আত তাবারী) রাসূল ﷺ বলেন, "হে হাসসান, আল্লাহর রাসূলের পক্ষে জবাব দাও। হে আল্লাহ, তাকে রুহুল আমীন [জিবরাঈল ﷺ] দ্বারা শক্তিশালী করুন" [বুখারী ও মুসলিম, আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত]

ইবন আসাকির হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ বলেন, "কে মুসলিমদের সম্মান রক্ষা করবে?" ফলে কাব বললেন, 'আমি করব', ইবন রাওয়াহা বললেন, 'আমি করব', হাসসান বললেন, 'আমি করব'। নবী ﷺ বললেন, "হ্যাঁ, অবমাননা কর এবং রুহুল আমীন তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন"। (তারিখ দিমাশক) তিনি ﷺ আরও বলেন, "বস্তুত, আল্লাহ রুহুল আমীন দিয়ে হাসসানকে সাহায্য করেন যখনই সে রাসূল ﷺ এর জন্য গর্ব করে অথবা তাঁর প্রশংসা করে।" [তিরমিযী, আইশা ﷺ হতে বর্ণিত]

২। উম্মাহ'র লোকদের, বিশেষ করে, মুজাহিদগণের মনোবল চাঙ্গা করা। সালামাহ ইবন আকওয়া বলেন, "আমরা রাসূল ﷺ এর সাথে রাতের বেলা খায়বারের অভিযানে বের হলাম। জনৈক ব্যক্তি আমির ইবন আল আকওয়াকে বললেন, 'আপনি কি আমাদেরকে আপনার কিছু নাশিদ গেয়ে শোনাবেন না?' আমির ছিলেন একজন কবি, ফলে তিনি (বাহন হতে) অবতরণ করলেন এবং নাশিদ গেয়ে লোকদের মনোবল বৃদ্ধি করলেন"। (বুখারী ও মুসলিম)

৩। কুফফার এবং মুরতাদদের আক্বিদাহ ও তাদের নীতির মিথ্যার স্বরূপ উন্মোচন করা, কুফফার সমাজের জঘন্য বাস্তবতা আর তারা যা উপস্থাপন করতে চায় তার অসারতা উম্মাহ'র সামনে তুলে ধরা, মুসলিমদের প্রতি কুফফারদের কঠিন আগ্রাসন প্রতিহত করা এবং কুফফারদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করা।

বর্ণিত আছে যে, ইবন সিরিন বলেন, "মুসলিমদের কবি হলেন হাসসান ইবন ছাবিত, আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা আর কাব ইবন মালিক। কাব মুশরিকদের যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন করতেন। আব্দুল্লাহ তাদের ও তাদের কুফরের নিন্দা করতেন। আর হাসসান তাদের বংশ পরম্পরায় আঘাত হানতেন।" তিনি আরও বলেন, "আমি আরও জানতে পেরেছি যে, কাব ইবন মালিকের এই কথায় ভীত হয়ে দাওস গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেঃ

আমরা তাদের বিনাশ করেছিলাম তিহামাহ আর খায়বারে,

তারপর আমরা তরবারি কোষবদ্ধ করে তুলে রেখেছিলাম।

আমরা তরবারির কাছে খবর জানতে চেয়েছিলাম আর যদি তারা (তরবারি) বলত,

"দাওস না ছাকিফ" তরবারির বলে উঠত।

ফলে দাওসগণ একে অন্যকে বলতে লাগল, "যাও নিজেদের চরকায় তেল দাও। ছাকিফদের সাথে যা করা হয়েছে সেরূপ যেন তোমাদের সাথে করা না হয় ।" (ইবন আব্দিল বার, আল ইসতি'আব)

৪। দ্বীনের বীরগণ ও তাদের শত্রুদের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধের সঠিক ও সত্য চিত্র তুলে ধরা এবং ইসলামের অনুসারীদের খাঁটি বীরগাঁথা সংরক্ষণ করা এই আশঙ্কায় যে, তা যেন রক্তের সওদাগরদের দ্বারা হারিয়ে না যায় বা লুণ্ঠিত না হয়।

ষষ্ঠ পথ

বিজয়ের ষষ্ঠ পাথেয় হল নিজের জন্য আল্লাহর প্রয়োজন উপলব্ধি করা এবং তার সমীপে বিনীত হওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন, " আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হোনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া স্বত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।" (সুরা তওবাহ: ২৫) ইবন কাছির বলেন, "ইবন জুরাইজ হতে বর্ণিত আছে যে, মুজাহিদ বলেন, এটা ছিল সুরা বারআ (অর্থাৎ সম্পর্ক ছিন্ন করার সুরা, যা সুরা আত তাওবাহ এর অপর নাম) এর নাযিলকৃত প্রথম আয়াত। বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে রাসূল ﷺ এর সাথে তাদের সাহায্য করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর তার নেয়ামত আর বদান্যতার কথা উল্লেখ করেন; আর তা ছিল শুধু তারই পক্ষ থেকে, তার ক্ষমতায়ন ও বরাদ্দকরণের ফল - তাদের সংখ্যা বা উপকরণের কারণে নয় - তিনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, বিজয় কেবল আল্লাহর তরফ থেকেই আসে, হোক তাদের সংখ্যা অনেক বা অল্প। কেননা, হুনায়নের দিন তাদের সংখ্যা তাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল কিন্তু তা তাদের কোন উপকারে আসে নি, কারণ রাসূল ﷺ এর সাথে অল্প কয়েকজন ব্যতীত তারা সবাই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিল।"

রাসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ তায়ালা আমার প্রতি নাযিল করেছেন যে, 'বিনম্র হও।'" (ইয়াদ ইবন হিমার হতে বর্ণিত, মুসলিম) ইবন আল ক্বায়্যিম ﷺ বলেন, "বস্তুত, কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর সাহায্যকামী হওয়া কোন ভুল-ত্রুটি ছাড়া দাম্ভিক হওয়ার চেয়ে উত্তম।" (তারিক আল হিজরাতাইন) আবু হুরায়রা ﷺ হতে মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, "এমন কেউ নেই যে আল্লাহর প্রতি বিনম্র হয়, আর আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন নি। এই মর্যাদা বৃদ্ধি দুনিয়াতে হয় সাহায্য, বিজয় আর সুনাম অর্জনের মাধ্যমে আর আখিরাতে হয় উচ্চ স্তর এবং প্রশংসনীয় মাকাম প্রদানের মাধ্যমে।"

ইবন বাত্তাল বলেন, "আইশা ﷺ বলেন, 'আসলে,তোমরা সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদত থেকে গাফেল আর তা হলঃ বিনয়'। আত তাবারী ﷺ বলেন, "বিনয় হল এক ফিৎনা যা দিয়ে আল্লাহ তার বান্দাকে পরীক্ষা করেন, এটা দেখার জন্য যে, কিভাবে তারা ঐ অবস্থায় তাকে মান্য করে আর যেহেতু তিনি জানেন দুনিয়া ও আখিরাতে তাতে তার বান্দার জন্য কল্যাণ নিহিত আছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় যখন রাসূল ﷺ মক্কায় প্রবেশ করেন, লোকেরা বলতে শুরু করে, 'তিনি অমুক, তিনি তমুক', তখন তিনি উটের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলতে থাকেন,

‘আল্লাহ মহান, আল্লাহ সুউচ্চ”। অতঃপর তিনি বলেন, “তারিক ইবন শিহাব বলেন, ‘যখন উমর ﵁ শামে আসেন তিনি একটি দুর্গে উপনীত হন। অতঃপর তিনি উট থেকে নেমে জুতা খুলে ফেলেন। পরে জুতা হাতে নিয়ে উটসহ পানিতে নেমে পড়েন। আবু ওবায়দা তাকে বলেন, ‘দুনিয়াবাসীদের মতে আজ আপনি এক অদ্ভুত কাজ করেছেন’। তিনি তার বুক চাপড়িয়ে বলেন, ‘আর কেউ যদি এই কথা বলত, হে আবু ওবায়দা, কিন্তু তোমরা (আরবরা) ছিলে সবচেয়ে নম্র আর নিচু স্তরের মানুষ, পরে আল্লাহ তোমাদের ইসলাম দিয়ে সম্মানিত করলেন। তাই যখনি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা সম্মান অন্বেষণ করবে তখন তিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।” (শারহ সহীহ আল বুখারী)

সপ্তম পথ

বিজয়ের সপ্তম নিয়ামক হল (আল্লাহ তায়ালার স্মরণ করা বা) জিকির করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার।" (আল আনফাল: ৪৫) আত তাবারী বলেন, "আল্লাহ তায়ালাকে বেশি বেশি স্মরণ করা" এর মানে হল, 'তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য ও বিজয় লাভের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করা। আর জিহ্বা এবং ক্বলবকে আল্লাহর জিকিরে অভ্যস্ত করা। কাতাদাহ বলেন, "আল্লাহ জিকিরকে অপরিহার্য করেন যখন কেউ সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেঃ তরবারি দিয়ে যুদ্ধের সময় ।"

আল ক্বুরতুবী এই আয়াতের তাফসীরে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "আলিমগণ এই জিকির এর ব্যাপারে তিন ধরনের মত পোষণ করেছেন। প্রথম মত হল, অন্তর যখন ভীত সন্ত্রস্ত থাকে তখন অবশ্যই জিকির করা উচিত, কারণ এই কঠিন মুহূর্তে জিকির অবিচল থাকতে সাহায্য করে। দ্বিতীয় মত হল, অবশ্যই জিহ্বা দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে অন্তরকে প্রশান্ত করা, কারণ বিশৃ-ঙ্খলার মুহূর্তে অন্তর বিক্ষিপ্ত থাকে - কিন্তু জিহ্বা দিয়ে জিকির চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। তাই তালুতের সহচরগণ যে দু'আ করেছিলেন সেই দু'আ দ্বারা তিনি জিকিরের আদেশ করেছেন, যতক্ষণ না অন্তরে নিশ্চয়তা আর জিহ্বায় স্মরণের দ্বারা দৃঢ়তা আসে, ' হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দিন এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন - আর আমাদের সাহায্য করুন সে কাফের জাতির বিরুদ্ধে।' (আল বাক্বারাহ: ২৫০) ইলমের শক্তি ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ব্যতীত যা অর্জন করা সম্ভব না, তা পুরুষের জন্য প্রশংসনীয় পরাক্রমের ব্যাপার। তৃতীয় মত হল, নিজের জান কুরবানির সময় আল্লাহর কৃত ওয়াদা এবং যে প্রতিদান তার জন্য অপেক্ষমাণ রয়েছে তা তাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে।"

আমি মনে করি, এই সকল মতই বিবেচনা করতে হবে, একজনের জবান আল্লাহর জিকির করতে এবং তার হৃদয় হিম্মত অনুভব করে, এই কথা স্মরণে রেখে যে, আল্লাহ তার জন্য দুনিয়ায় সাহায্য আর আখিরাতে জান্নাতের প্রতিশ্রু-তি দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা মুসা ও হারুন ﷺ কে বলেন, "আমার জিকিরের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করো না।" (তা-হা: ৪২) ইবন কাছির ﷺ বলেন, "এর মানে হল, ফিরাউনকে মোকাবিলার সময় তাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে

নিষ্প্রভ হওয়া উচিত না, কারণ আল্লাহর স্মরণ তাদের সাহায্য ও শক্তিশালী করবে, পাশাপাশি (ফিরাউনের বিরুদ্ধে) তাদের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব প্রদান করবে ।”

জানা থাকা প্রয়োজন যে, যুদ্ধের সময় আল্লাহর জিকির হওয়া উচিত গোপনে। আল হাকিম সত্যায়ন করেছেন যে, আবু মুসা ﷺ বলেন, রাসূল ﷺ যুদ্ধের সময় উঁচু আওয়াজ অপছন্দ করতেন।[৫]

৫ লেখকের এই হাদিসের রেফারেন্স যুদ্ধের সময় জিকিরের ক্ষেত্রে উঁচু আওয়াজ ব্যবহার করা নাকচ করে না। বরং, যুদ্ধ ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ এর উঁচু আওয়াজ অপছন্দ বলতে শত্রুদের মোকাবিলার মুহূর্তকে বোঝায়: তাঁর সময়ে যখন তরবারি ঝংকার দিয়ে উঠত আর সমকালীন সময়ে যখন ট্রিগার চাপা হয়, আর আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

অষ্টম পথ

বিজয়ের অষ্টম নিয়ামক হল দু'আ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "বলুন, আমার পালনকর্তা পরওয়া করেন না যদি তোমরা তাঁকে না ডাক " (আল ফুরক্বান: ৭৭) এবং "তাই তাঁকে ডাকো, আল্লাহর জন্য দ্বীনকে মুখলিস করে।" (গাফির: ৬৫) এবং "তাঁকে আহবান কর ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।" (আল আরাফ: ৫৬) এবং "তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে।" (গাফির: ৬০) এবং "আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুত: আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।" (আল বাক্বারাহ: ১৮৬)

রাসূল ﷺ বলেন, "দু'আ হল ইবাদত।" (ইবন মাজাহ, আবু দাউদ, আত তিরমিযী, নোমান ইবন বাশির হতে বর্ণিত) আল হাকিম এবং অন্যান্যগণ আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট দু'আর চেয়ে আর কোন কিছুই অধিক মূল্যবান নয়।"(আল মুস্তাদারাক) তিনি ﷺ আরও বলেন, "যে আল্লাহর নিকট দোয়া করে না আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত হন।" (আত তিরমিযী, আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত) ইবন তাইমিয়্যাহ ﷺ বলেনঃ "বিজয় এবং রিযক বিভিন্ন মাধ্যম থেকে আসে। এর মধ্যে সবচেয়ে নিশ্চিত মাধ্যম হল ঈমানদারদের দু'আ ।" তিনি আরও বলেন, "বদরের দিন যখন বিজয় নির্ধা-রিত হয় আর নবী ﷺ সাহাবাদের আসন্ন বিজয় ও শত্রুদের পরাজয়ের সংবাদ দেন, তা ছিল নবী ﷺ এর সাহায্য প্রার্থনা ও দু'আর ফলস্বরূপ।" (মাজমু' আল ফাতওয়া)

এই ছিলেন রাসূল ﷺ যিনি শত্রুদের সংখ্যাধিক্য ও শক্তি সামর্থ্যের তুলনায় তাঁর সাহাবাদের অপ্রতুল সংখ্যা আর দুর্বলতার কারণে কেবল তারই নিকট আশ্রয় কামনা করেন যার হাতে বিজয় নিহিত। "আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে।" (আল ইমরান: ১২৬) উমর ইবন আল খাত্তাব ﷺ বলেন, "বদরের দিন রাসূল ﷺ মুশরিকদের দিকে তাকান, তারা ছিল সংখ্যায় এক হাজার, আর তাঁর সাহাবাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন যারা ছিলেন সংখ্যায় মাত্র তিনশত উনিশ জন। তখন রাসূল ﷺ কিবলার দিকে ফিরে হাত প্রসারিত করে তাঁর রবকে ডাকতে থাকেনঃ 'হে আল্লাহ, আপনি যে প্রতিশ্রুতি

দিয়েছেন তা পূরণ করুন। হে আল্লাহ, যদি এই অল্প সংখ্যক মুসলিম ধ্বংস হয়ে যায় পৃথিবীতে আপনার ইবাদত করার মত কেউ অবশিষ্ট থাকবে না'। কিবলার দিকে ফিরে হাত প্রসারিত করে তাঁর রবকে ততক্ষণ ডাকতে থাকেন, যতক্ষণ না তাঁর ঘাড় থেকে জোব্বা পড়ে যায়।" (মুসলিম)

তিনি ﷺ মুশরিকদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে দু'আ করেন এই বলে যেঃ "হে আল্লাহ, কিতাব নাযিলকারী, দ্রুত বিচার গ্রহণকারী; হে আল্লাহ দলসমূহ-কে পরাভূত করুন; হে আল্লাহ, তাদের পরাজিত করুন, তাদের ভিত কাঁপিয়ে দিন।" (বুখারী ও মুসলিম, আব্দুল্লাহ ইবন আবি আওফা থেকে বর্ণিত) তিনি ﷺ বিশেষ করে তাদের প্রধান আর নেতাদের নাম উল্লেখ করে তাদের বিরুদ্ধে দোয়া করেন, যেমন ইবন মাসউদ ﷺ উল্লেখ করেন, "রাসূল ﷺ কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে কুরাইশদের কতিপয় সদস্যের বিরুদ্ধে দু'আ করেনঃ শায়বা ইবন রাবিয়াহ, উতবা ইবন রাবিয়াহ, আল ওয়ালিদ ইবন উতবা, আবু জাহল ইবন হিশাম। আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমি তাদের প্রত্যেককে ভূলু-ণ্ঠিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি, রোদে তাদের অঙ্গ বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)

জেনে রাখুন, হে আল্লাহর মিত্র, আপনি এমন জায়গায় আছেন যেখানে দু'আ কবুল হয়। সাহল ইবন সাদ আস সা'দী বলেন, "দুটি সময়ে আসমানের দরজা খোলা হয় আর তখন কোন প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা সচরাচর ফেরানো হয় না, যখন আযান দেয়া হয় এবং যখন আল্লাহর রাহে (যুদ্ধের জন্য) সারি গঠন করা হয়।" (মালিক কর্তৃক বর্ণিত)

তাই হে মুজাহিদ, এমন সময় অন্বেষণ করুন যখন দু'আ কবুল হয়, যেমন জুম'আর দিনের বিশেষ সময়, আযান দেয়ার পর, বৃষ্টির সময়, আর রাতের শেষ তৃতীয়াংশে। আবু হুরায়রা ﷺ বলেন যে রাসূল ﷺ বলেনঃ "প্রতি রাতে শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকতে আমাদের রব শেষ আসমানে অবতরণ করেন[৬] এবং বলতে থাকেন, 'কে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব? কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করব?'" (বুখারী ও মুসলিম) অন্য বর্ণনায়, "কে আমার কাছে রিযক চাইবে,

৬ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আল খাত্তাব (মৃত্যু ৩৮৮হি) বলেনঃ "এই হাদিস এবং অনুরূপ যা কিছু আল্লাহর সিফাতের (গুণাবলীসমূহ যা আল্লাহর সত্তা ও কাজ প্রকাশ করে) সাথে সংশ্লিষ্ট, এক্ষেত্রে সালাফদের অবস্থান হল, সেগুলো সেভাবে মেনে নেয়া এবং যাহির (বাহ্যিক অর্থের) ভিত্তিতে তা প্রয়োগ করা আর যেকোন ধরনের খাফিয়্যাহ (কিভাবে বা কোন প্রক্রিয়ায়, সেই ব্যাখ্যা প্রদান করে) পরিত্যাগ করা। (আ'লাম আল হাদিস)

আমি তাকে তা দান করব? কে আমার কাছে কোন মুসিবত থেকে পরিত্রাণ চাইবে, আমি তার থেকে মুসিবত দূর করব?" (আহমাদ)

আমি প্রকৃতই আশা করি যে, আল্লাহ আমাদের আহবানে সাড়া দিবেন, যেহেতু আমরা কাছের ও দূরের সকলের দ্বারা নির্যাতিত এবং তাবৎ পৃথিবী আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সমবেত হয়েছে। রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে, কারণ তিনি ﷺ মু'আয ﷺ কে বলেন, "নিপীড়িতের দু'আ থেকে সাবধান থাক, কেননা, তার এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই।" (বুখারী ও মুসলিম) এক মজলুম নবী ছিলেন যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল, অতঃপর তিনি দু'আ করেন আর কিরূপে তাঁর দু'আ কবুল হয়। " তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যারোপ করেছিল। তারা মিথ্যারোপ করেছিল আমার বান্দা নূহের প্রতি এবং বলেছিল: এ তো উন্মাদ। তাঁরা তাকে হুমকি প্রদর্শন করেছিল। অতঃপর সে তার পালনকর্তাকে ডেকে বলল: আমি অক্ষম, অতএব, আমাকে সাহায্য করুন। তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রস্রবণ। অতঃপর সব পানি মিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে। আমি নূহকে আরোহণ করালাম এক কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত জলযানে।" (আল ক্বামার: ৯-১৩)

জেনে রাখুন হে মুজাহিদ, বিজয়ের অন্যতম পাথেয় হল আমদের দলে দুর্বল-দের উপস্থিতি আর আমাদের জন্য তাদের কৃত দু'আ। আবু সুফিয়ান বলেন যে, "হিরাকল আমাকে বলে যে, 'আমি তোমাকে প্রশ্ন করি, সম্ভ্রান্তগণ তাঁকে অনুসরণ করে নাকি দুর্বলগণ, জবাবে তুমি দাবি কর যে দুর্বলগণ, বস্তুত তারাই হলেন রাসূলদের সহচর।" (বুখারী ও মুসলিম, ইবন আব্বাস হতে বর্ণিত) আর রাসূল ﷺ সা'দকে ﷺ বলেন, "তোমাদের মাঝে দুর্বলগণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে কি তোমরা বিজয় বা রিযক পেয়ে থাক?" (বুখারী) এই হাদিস থেকে দেখা যায়, নারী, শিশু ও বৃদ্ধের ন্যায় দুর্বল মুজাহিদদের বিবেচনা করতে হবে। কারণ তারা প্রায়শই বিনীত ভক্তি ও আন্তরিকতার সাথে দু'আ করে থাকেন। তারা অভাবী এবং আল্লাহর উপর তারা অধিক আস্থা রাখেন।

উপসংহারে, আমি আল্লাহ তায়ালার বাণী স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, "হে ঈমানদানগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।" (আল ইমরান: ২০০) এবং " আর আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা মুমিন হও।" (আল মায়েদাহ: ২৩) এবং "নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা তাকওয়াশীল এবং যারা সৎকর্ম করে।" (আন নাহল: ১২৮) এবং "আল্লাহ

নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর।" (আল হাজ্জ: ৪০) এবং " হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার।" (আল আনফাল: ৪৫) আর এগুলোই বিজয়ের পাথেয় যা আল্লাহর কিতাবে খুঁজে পাওয়া যায়, তাই শক্তভাবে সেগুলো ধারণ করুন।

مكتبة الهمّة

মাকতাবাহ আল হিম্মাহ